গণতন্ত্রের নিত্যকর্মপদ্ধতি

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

রাজ্যের নাম গ্রাউবুন্ডেন। নামটা রাগী রাগী হলেও রাজ্যটা ভারী সুন্দর, আল্পস-এর কোলে, দূরে পাহাড়, কাছেও পাহাড়, সবুজ উপত্যকা, নীলিমায় নীল আকাশ, ছিপছিপে সব নদী, পাহাড়ের কোলে পরিপাটি গ্রাম, জনপদ। সুইটজারল্যান্ডের পূর্ব প্রান্তের এই 'ক্যান্টন' অর্থাৎ প্রদেশটি আয়তনে ৭০০০ বর্গ কিলোমিটার, মোটামুটি বর্ধমান জেলার সমান। লোকসংখ্যা লাখ দেড়েক। (বর্ধমানের প্রায় আশি লাখ।) এই রাজ্যেই আছে দাভোস, যে শহরে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম-এর বৈঠক বসে, কর্পোরেট দুনিয়ার মহারথীরা সমবেত হন, নানা দেশের রাষ্ট্রনায়করাও যোগ দেন। বিশ্ব অর্থনীতিতে ক্রমাগত ধস নামার ফলে ইদানীং অবশ্য দাভোস সম্মেলনের মহিমা কিঞ্চিৎ খাটো হয়েছে।

কয়েকশো বছর আগেও গ্রাউবুন্ডেনে সম্মেলন হত। একটা নয়, বহু সম্মেলন। কয়েক দিন নয়, সম্বৎসর। নানা জায়গায় নিয়মিত সমবেত হতেন স্থানীয় মানুষ। আর সেখান থেকেই রাজ্যপাট চালানো হত, মানে সরকারি নীতি ঠিক করা, সেই নীতি অনুযায়ী প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া, সবই হত ওই সব সভায়, কিন্তু তা হলে দেশের সরকার কী করত? উত্তর সহজ। গ্রাউবুন্ডেন ছিল একটি গণতন্ত্র। আমাদের চেনা গণতন্ত্র নয়, আমাদের প্রতিনিধিদের ভোট দিয়ে ওপরে পাঠাব এবং তাঁরা ওপর থেকে আমাদের শাসন করবেন, পাঁচ বছর অন্তর ভোট দেওয়া ছাড়া দেশচালনার নীতি নির্ধারণের আমাদের আর কোনও প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা থাকবে না, কোনও বিষয়ে প্রতিবাদ বা মতামত জানতে চাইলে কেবল খবরের কাগজে চিঠি লিখতে হবে অথবা ঝাণ্ডা নিয়ে রাস্তায় নামতে হবে— এমন ব্যবস্থা নয়, সেই প্রদেশে প্রচলিত ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, যে গণতন্ত্রে জনসাধারণ যথাসম্ভব নিজেরাই নিয়মিত সমবেত হয়ে দেশ চালনার নীতি নির্ধারণ করেন।

প্রদেশ না বলে দেশ বলাই সমীচীন। কারণ এখন যেখানে গ্রাউবুন্ডেন, মোটামুটি সেই অঞ্চলটি ১৪৯৯ সালে নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করে। ইউরোপের মানচিত্র তখন নিত্য বদলাচ্ছে, পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ ক্রমাগত টুকরো টুকরো হচ্ছে, কিন্তু গ্রাউবুন্ডেনের স্বাধীনতা ইতিহাসে এক বিশেষ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত, কারণ রাজা-মহারাজা এবং অভিজাতবর্গ শাসিত ইউরোপের বুকে ওই একফালি পাহাড়ি দেশের মানুষ সে দিন স্থির করেছিলেন, নিজেরাই নিজেদের শাসন করবেন। ভূগোল ওঁদের সাহায্য করেছিল—প্রাকৃতিক কারণে চারপাশের নানা দেশ বা প্রদেশ থেকে সে রাজ্য অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। তাই 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও' বললে প্রতিবেশী শাসকরা হাতিয়ার নিয়ে তেড়ে আসেনি। সাহায্য ছিল ইতিহাসেরও। আল্পস-আশ্রিত ওই সব অঞ্চলের মানুষ, অনেকটা ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণেই, কালক্রমে নিজেরা নিজেদের দেখাশোনা করার ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন। সুইটজারল্যান্ডের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের নানান তরিকা আজও সেই ঐতিহ্যকে কুর্নিশ করে চলেছে। যেমন ইউরোপের অন্য কিছু এলাকাতেও।

তবু গ্রাউবুন্ডেন স্বতন্ত্র, অনন্য, কারণ তিনশো বছরের বেশি সময় ধরে ওই দেশটি একমনে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের অনুশীলন করেছিল, যত দিন না ফ্রান্স থেকে এক সর্বগ্রাসী সম্রাটের অশ্বমেধের ঘোড়া এসে ইউরোপের মানচিত্রের দখল নেয়। সম্রাটের নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। তাঁর আমলে স্বাধীন রাজ্যটি তার স্বাতন্ত্র্য হারায়। নেপোলিয়নকে ইতিহাস অনেকখানি জায়গা দিয়েছে, গ্রাউবুন্ডেন ঘাসের আগায় শিশিরবিন্দুমাত্র। কিন্তু বিন্দুটি বড়ো উজ্জ্বল-গ্রাউবুন্ডেন এ কালের ইউরোপের প্রথম গণতন্ত্র, অন্তত স্কারবরো-নিবাসী ব্রিটিশ লেখক রজার অসর্বোন-এর মতো। আসবোর্ন একটি ভারী চমৎকার বই লিখেছেন। বইটির নাম 'অব দ্য পিপল বাই দ্য পিপল'। আড়াই হাজার বছর আগেকার এথেন্স থেকে শুরু করে ইউরোপ আমেরিকা হয়ে আজকের দুনিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের গণতন্ত্রের চেহারা চরিত্র নিয়ে পঞ্চদশ অধ্যায়। সংক্ষিপ্ততম অধ্যায়টির নাম 'ডিমক্র্যাসি ইন দ্য হাই অ্যাল্পস'। গ্রাউবুন্ডেনের গল্প।

কয়েক শতাব্দী আগেকার একটি ইউরোপীয় জনপদের গণতন্ত্রের কাহিনি জেনে আমাদের লাভ কী? একটা রূপকথা পড়ার প্রসাদ ছাড়া? লাভ হয়তো সত্যিই নেই। তবে সেই রাজ্যের সমাজ এবং রাজনীতির দু'একটা অভ্যেসের কথা একটু বিশেষ ভাবে স্মরণ করা যায়, লক্ষ করা যায়। হয়তো তা থেকে আমরা আমাদের সমাজ এবং রাজনীতি সম্পর্কে কিছু নতুন ভাবনা ভাবতেও পারি। লাভ না হোক, তাতে ক্ষতি নেই।

কীভাবে চলত সেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র? গোটা প্রদেশটি ভাগ করা হয়েছিল প্রায় অর্ধশত কমিউনে। এক একটি কমিউন-কিছু গ্রাম বা জনপদের সমাহার। কমিউনের হাতে অনেকখানি স্বশাসনের অধিকার, নিজেদের নিয়মকানুন, প্রশাসন, এমনকী বিচারব্যবস্থাও সেই অধিকারের অন্তর্গত। বড়ো ব্যাপারের জন্য জাতীয় সংসদ ছিল বটে, কিন্তু সেই সংসদের সদস্যরা মনোনীত হতেন কমিউন থেকে, আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রত্যেক কমিউন থেকে সংসদে প্রতিনিধি নেওয়া হত, যাতে কোনও একটি কমিউন পারাভারী না হয়ে ওঠে। এবং বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করতে বসে জাতীয় সংসদকে খেয়াল রাখতে হত, কমিউনগুলি সেই প্রশ্নে কী ভাবে মত দিয়েছে। নীচের তলার মতামতকে আগ্রহ্য করে ওপর থেকে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হবে, এমনটা ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন না ওঁরা।

ওই নীচের তলা থেকেই সদস্যরা একটা মানসিকতার অনুশীলনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতেন, যাকে বলা চলে

ঐকমত্যের মানসিকতা। কমিউন ছিল সেই অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ পরিসর। অনুশীলন চলে বছর'ভর, নিয়মিত। সাধারণত রবিবার সকালে প্রার্থনার পরে কমিউনের অন্তর্গত গ্রামগুলির নাগরিকরা নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হন। নাগরিক মানে অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ—মেয়েদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পেতে আরও অনেক কাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। সেই সভাতেই বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়, সকলেই তাতে যোগ দিতে পারেন। নানা নাগরিকের নানা মত, যেমন এ কালে তেমনই সে কালেও। কিন্তু একান্ত নিরুপায় না হলে ভোটাভুটি হয় না। ওই মুক্তমঞ্চে দাঁড়িয়ে খোলামেলা সওয়াল-জবাবের মধ্যে দিয়েই একটা মীমাংসায় পৌঁছনোর চেষ্টা চলে। ভিন্নমত থেকে শুরু করে একমত হয়ে ওঠাটাই 'স্বাভাবিক' বলে গণ্য হয়।

এই রীতি আমাদের কাছে অচেনা, অস্বাভাবিক ঠেকবে, সেটাই স্বাভাবিক। আমরা এমন সভায় সমবেত হলে একশো বছর তর্ক করে যাব, ঐকমত্য দূর অস্ত্। তার একটা খুব বড়ো কারণ, আমরা ব্যক্তিগত মতামত এবং লক্ষ্যকে সার্বভৌম বলে মনে করি। গ্রাউবুন্ডেনের সমাজে ব্যক্তির এই ভূমিকা স্বীকৃত ছিল না, ব্যক্তি সেখানে গোষ্ঠীর অঙ্গ। গোষ্ঠীর স্বার্থ, গোষ্ঠীর লক্ষ্য, গোষ্ঠীর মর্যাদা সেখানে সার্বভৌম, ব্যক্তি তার প্রতি অনুগত থেকে নিজের মতামত জানাতে পারে, গোষ্ঠীকে লঙ্ঘন না করে নিজের জীবন নিজের মতো করে চালাতে পারে, কিন্তু সেই মূল জায়গায় বিরোধ বাধলে তাকে নিজের মত বিসর্জন দিতে হয়। এই সমাজে কমিউনের সদস্যরা হাজার মতবিরোধ অতিক্রম করে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন, এটাই প্রত্যাশিত ছিল। আবার, তৃণমূল থেকে গড়ে ওঠা এই মীমাংসার অভ্যেসটাই ওপরের স্তরেও বাহিত হত, কমিউন থেকে প্রেরিত সদস্য নিয়ে তৈরি জাতীয় সংসদেও ভিন্নমত থেকে ঐকমত্যে পৌঁছনোর রীতিই প্রবল ছিল। জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, সেই চেতনাই আবার জীবনধারাকে চলমান রাখে।

অন্য এক দুনিয়ার অন্য এক যুগের অন্য এক গণতন্ত্রের এই কাহিনি পড়ে 'আহা যদি এমন হত' গোছের রোমান্টিক বেদনায় আকুল হয়ে পড়ার কোনও কারণ নেই। ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে কমিউনের পায়ে সমর্পণের প্রশ্নও আজ আর ওঠে না। কিন্তু সমস্ত বিষয়ে সর্বক্ষণ কেবল আমরা বনাম ওরা-র অনন্ত সংঘাতে বিদীর্ণ এই গণতন্ত্রের সহযাত্রী হয়ে চলতে চলতে যখন গ্রাউবুন্ডেনের ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়াই, তখন একটা অমোঘ প্রশ্ন মনের মধ্যে ফেনিয়ে ওঠে। স্বার্থ এবং লক্ষ্যের বিরোধকে অস্বীকার না করেও ভিন্নমত থেকে ঐকমত্যে পৌঁছনোর একটা অভ্যাস তৈরি করতে না পারলে আমরা কি কোনওদিনই এই সর্বগ্রাসী সংঘাতের বলয় থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারব? এবং, যে কোনও একটা স্তরের স্বার্থকে একটা উচ্চতর স্তরের স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বিরোধ মীমাংসার সেই অভ্যেস জন্মাবে কী উপায়?

উচ্চতর বা বৃহত্তর স্বার্থ মানে কিন্তু কোনও বায়বীয় আদর্শ বা নৈতিকতার অনুশাসন নয়, অনুশাসনে আজ আর কেউ কান দেবে না। স্বার্থ ব্যাপারটা প্রয়োজনভিত্তিক হলেই টেকসই হয়, গ্রাউবুন্ডেনে কমিউনের প্রয়োজনের খাতিরেই নাগরিকরা নিজস্ব মতের বিরুদ্ধে গিয়েও অনেক কিছুই মেনে নিতেন। নেওয়াটাকে পরাজয় বলে মনে করতেন না। আমাদের মুশকিল হল, আমরা মেনে নিতেই ভুলে গিয়েছি। নিজের গ্রাম, নিজের শহর, নিজের জেলা, নিজের রাজ্য—কারও স্বার্থেই আমরা নিজেদের ক্ষুদ্রতম স্বার্থের সূচাগ্র ভূমিকাও ছাড়তে রাজি নই। আমরা এই অর্থে দুর্যোধনের সন্তান। আমদের রাজনীতি তৃণমূল স্তর থেকে দুর্যোধনী তন্ত্রের সাধনা করে চলেছে। ফলে সমস্ত স্তরে, সমস্ত ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের মানে দাঁড়িয়েছে কুরুক্ষেত্র। একেবারে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নিশ্চিহ্ন না হওয়া অবধি শান্তি নেই।

প্রশ্ন হল, ছোটো স্বার্থের দাসত্ব থেকে বড়ো স্বার্থের সাধনায় উত্তরণের উপায় কী? কী ভাবে আমরা সেই উত্তরণের পথে ফিরতে পারি? সমাজের মানসিকতায় পরিবর্তন, রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের উচ্চ চিন্তা, আইনসভার মতো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির গুণমানে উন্নতি—এই ধরনের সুনীতির কথা অনেক বলা হয়েছে, আরও অনেক বলা হবে। এগুলির নিশ্চয়ই মূল্যবান, জরুরি। কিন্তু এবং মূল্যবান নীতির কথা অষ্টপ্রহর সাতকাহণ করে বলে গেলেই যে সেই নীতি অনুসৃত হবে, এমন তো মনে হয় না। বিশেষ করে গোটা সমাজটা যদি সর্বক্ষণ সর্ববিষয়ে কাজিয়ায় মেতে থাকে, তা হলে ঐকমত্য দূরে থাক, রক্তপাত ঠেকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়ে। সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ তার প্রকট দৃষ্টান্ত।

তা হলে? গ্রাউবুন্ডেনের কাহিনি থেকে একটা ছোটো শিক্ষা নিতে পারি আমরা। সেখানে কমিউনের সভায় যে প্রকল্প অনুমোদিত হত, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সবাইকে সেই প্রকল্পের কাজে যোগ দিতে হত। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তার একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন অসবোর্ন : 'সর্বজনীন শ্রমদানের নির্ধারিত দিনটিতে সকালবেলায় গ্রামের ঘন্টাঘর থেকে তিন বার ঘন্টা বাজানো হত, তিন বার তিন ভাবে। তৃতীয় ঘন্টা অবধি সময়, তার মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের একজন প্রতিনিধি গ্রামের নির্ধারিত চত্বরে কোদাল, বেলচা ইত্যাদি সরঞ্জাম হাতে হাজির হতেন। গ্রামের চার জন মোড়ল শ্রমিকের মাথা গুনে নিতেন— যে বাড়ি থেকে কেউ আসত না তার জরিমানা হত—তারপর শ্রমিকদের নিয়ে কাজের জায়গায় পৌঁছে যেতেন।'

এ কালের রাজনীতির ধারণা আমাদের ভাবার অভ্যাসগুলোকে নষ্ট করে দিয়েছে, তাই এই বিবরণকে এক নজরে নেহাতই একটা গ্রামজীবনের বিবরণ বলে মনে হয়। কিন্তু একটু মন দিয়ে ভাবলে খেয়াল হয়, এই বৃত্তান্তে

এক গভীর রাজনীতি নিহিত আছে। সদর্থক রাজনীতি। একটা সমাজের সদস্যরা খোলামেলা আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি কাজের সিদ্ধান্ত নিলেন, তারপর সেই কাজ সম্পাদনে এগিয়ে এলেন সবাই— এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে কৌমচেতনা গড়ে উঠল তা প্রবলতর হল, তার ভিতটা খুব জোরদার, কারণ তার ভিত্তিতে আছে কৌম-শ্রম। এই যৌথ শ্রমদানের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর স্বার্থের যে বোধ গড়ে উঠে, বহু ক্ষুদ্রস্বার্থের তাড়না এবং মন্ত্রণাকে সে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই রুখে দিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের সমাজে ও রাজনীতিতে যে নিরন্তর সংঘাতের পরম্পরা চলছে, ওপর থেকে উপদেশ দিয়ে তাকে থামানো যাবে বলে ভরসা হয় না, সমাজের ভিতর থেকে তাকে প্রতিরোধ করার উপায় খুঁজতে হবে, এবং একটা যথার্থ কৌম-শ্রমের রাজনীতি দিয়েই বোধহয় সেটা করা সম্ভব।

আষাঢ়ে কাহিনি? অন্য এক যুগের, অন্য এক জগতের অননুকরণীয় দৃষ্টান্তের পিছনে সময় ও শব্দের অপচয়? বেশ, তবে একটি সাম্প্রতিক কাহিনির দিকে তাকানো যাক। একেবারে দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বিধৃত সমকালের এক টুকরো। হাওড়ার একটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং উপপ্রধান দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত, এবং ফেরার। অতঃপর তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দল থেকে সমান সংখ্যায় প্রতিনিধি নিয়ে একটি সর্বদলীয় কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সেই কমিটিই গ্রামে উন্নয়নের কাজ চালাচ্ছে। এবং সে কাজ তরতরিয়ে চলছে।

অবশ্যই ব্যতিক্রম। কিন্তু অন্য দিক থেকে দেখলে, সম্ভাবনাও। দলীয় রাজনীতির সর্বগ্রাসী সংঘাতের মাঝখানে বসে একটা ছোটো এলাকার মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে কী ভাবে জোট বাঁধতে পারেন, তার এই নজির দেখে ভরসা হয়। 'মানুষের শুভবুদ্ধি'র ভরসা নয়, ও-সব সত্যযুগের কথা, এখন ঘোর কলি। ভরসা মানুষের স্বার্থবুদ্ধির। প্রয়োজনবোধের। কোনও একটি অঞ্চলের বা সমাজের বা কমিউনিটির মানুষ যদি নিজেদের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন এবং সেই প্রয়োজন পূরণের জন্য সমবেত উদ্যোগ করতে পারেন, তবে সংঘাতসর্বস্ব রাজনীতির আপাত-দুরতিক্রম্য বাধাও দূর করা অসম্ভব নয়।

বস্তুত, ব্যতিক্রম হলেও নিতান্ত বিরল বলা যাবে না এই দৃষ্টান্তকে। সংবাদমাধ্যমের নজরের আড়ালে এমন নানা সহযোগের দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আড়ালে থাকাটা খুব কঠিন নয়, কারণ সচরাচর ঐক্য নয়, দ্বন্দ্বই সংবাদযোগ্য। এই সব সদর্থক কাহিনিগুলির একটি প্রায় ব্যতিক্রমহীন যোগসূত্র থাকে— কাজের প্রয়োজনে এবং কাজের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে সমবেত হন, কাজেই সূত্র থাকলে তবেই সমবেত থাকাটা সহজ হয়, স্বাভাবিক হয়। 'দশে মিলি করি কাজ' কথাটা আমরা বরাবর এক অর্থেই বুঝে এসেছি, যে, দশে মিলে কাজ করা যায়। এর একটা বিপরীত অর্থও আছে, এবং সে অর্থ অত্যন্ত মূল্যবান— দশে মিলে কাজ করলে কাজটাই দশ জনকে মিলিয়ে রাখতে পারে। কী 'মধ্যযুগ' -এর গ্রাউবুন্ডেনে, কী 'আধুনিক' হাওড়ায়।

মুশকিল হল, সংঘাতের কাঁটাগুলোকে সরাতে না পারলে দশ জনের মিলনের সুযোগই তৈরি হয় না। অথচ আমাদের প্রতি মুহূর্তের জীবনচর্যায় সে কাঁচা একেবারে পায়ে পায়ে ফুটতে থাকে। হাওড়ার ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্ণধারার দুর্নীতির দায়ে ফেরার না হলে ঐকমত্যের গণতন্ত্র এই সুযোগটা পেত না, এ এক নির্মম পরিহাস বইকী। স্বাভাবিক অবস্থায় এমন সুযোগ মেলে না, মেলার কথাও নয়, ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে বৃহৎ স্বার্থে পৌঁছনোর পথটা এমনিতেই দুর্গম, সতত যুযুধান দলতন্ত্র সেই পথটাকে প্রায়শই অগম্য করে তোলে। অতএব, প্রশ্ন থেকেই যায়। বিরোধ থেকে সহমতের দিকে অগ্রগতির পথটা কী?

আবারও ফিরে যায় আল্পসের কোলে। গ্রাউবুন্ডেনে কমিউনের সভায় সব তর্কই হত খোলাখুলি। সাধারণ তর্কাতর্কির মধ্য দিয়েই একটা মীমাংসায় পৌঁছনোর চেষ্টা চলত। কোনও বিষয়ে যদি অগত্যা ভোট করতে হত, সে ভোট গোপন ব্যালটে হত না, সকলের সামনে প্রত্যেকে নিজের মত জানাতেন। এমনকী কোনও পদে কাউকে নির্বাচিত করতে হলেও ভোটাভুটি হত প্রকাশ্যে। এই পদ্ধতির একটা মস্ত গুণ ছিল। এতে মত বা পছন্দের অমিলগুলোকে কোনও পূর্বনির্ধারিত ঐকমত্যের তর্জনী তুলে অস্বীকার বা নাকচ করার বালাই ছিল না, বরং অমিল থাকলে সে বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করার রীতিই স্বাভাবিক বলে গণ্য হত। এই রীতির একটা মস্ত সুবিধার দিক হল, মানুষ প্রথম থেকেই জানেন যে, মতের অমিল থাকতে পারে, কিন্তু সে অমিল কারও অজানা থাকবে না এবং তারপরেও কাজের তাগিদে, এগিয়ে যাওয়ার তাগিদে কিছু মানুষকে হয় নিজেদের মত বদলাতে হবে অথবা আপন ভিন্নমত নিয়েই বহুজনীন সিদ্ধান্তে শামিল হতে হবে। ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত অথবা অন্য গোত্রের মতানৈক্য, বিবাদ ও বিরোধকে সরাসরি স্বীকার করে নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক শুরু করলে মীমাংসার পথ অনেক সহজ হয়ে যায়, ঠিক কোথায় কতখানি আপস করতে হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট থাকে, ফলে ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্গে বৃহৎ স্বার্থের টানাপোড়েনও একটা যুক্তিসম্মত নিরসনের দিকে যেতে পারে।

মতানৈক্য নিয়েই এগিয়ে যাওয়ার এই অভ্যাস যে কোনও গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু এই অভ্যাস আকাশ থেকে পড়বে না। দৈনন্দিন জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে তার অনুশীলন আবশ্যক। কেবল রাজনীতি পরিসরে নয়। বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির পরিসরটির যে হাল দাঁড়িয়েছে, তাতে সেখানে নতুন কোনও অভ্যাসের অনুশীলন কত দূর সম্ভব, বলা কঠিন। বরং সেই পরিসরের বাইরে, বৃহত্তর সামাজিক বলয়ের নানা মঞ্চে নিতান্তই সামাজিক অভ্যাস হিসেবে তার চর্চা সম্ভব। মুশকিল হল, আমাদের 'অ-রাজনৈতিক' বিতর্কের পরিসরগুলিও ভয়ানক ভাবে রাজনীতি-প্রভাবি। তথাকথিত নাগরিক সমাজের যে বিতর্ক সান্ধ্য টেলিভিশনের পর্দায় বিভিন্ন

চ্যানেলে নিয়মিত দৃশ্যমান, তার মূল চরিত্রটি সেই এক সুরে বাঁধা—একে অন্যকে দমিয়ে দেওয়ার সুর। নানান পক্ষের মতের অমিল থাকে, সেটা সমস্যা নয়, কিন্তু মতের অমিলটাকে একটা সদর্থক দৃষ্টিতে স্বীকার করার অভ্যেসই আমাদের নেই, ফলে বিতর্কমঞ্চ সহজেই বিবাদের আখড়ায় পরিণত হয়। অথচ দরকার ছিল বিবাদগুলোকে বিতর্কে পরিণত করে কাজের পথ খোঁজার।

হয়তো আমাদের সমস্যার মূলে আছে এই সত্য যে, আমাদের সমাজে সম্মিলিত ভাবে কাজ করার অভ্যাসটাই সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সমাজের জন্য যা কিছু করণীয়, তা হয় রাষ্ট্র করে দেবে, বা পুরসভা, কিংবা রাজনৈতিক দল, অথবা এন জি ও। গ্রাউবুন্ডেনে সবাই মিলে একটা রাস্তা বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে সবাই মিলে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করত। এটা আমরা ভাবতেও পারি না। অথচ হাওড়ার গ্রাম-পঞ্চায়েতের ঘটনাটিই দেখিয়ে দেয়, এমন নিজস্ব সমবেত উদ্যোগ অসম্ভব তো নয়, বরং খুবই সম্ভবপর, এবং ফলপ্রসূ। সব সময়েই যে রাস্তা বানানো বা ফেরিঘাট সারানোর মতো কাজ করতে হবে, তা নয়, কাজের কোনও শেষ নেই, কাজের বৈচিত্র্যও অসীম। প্রতি মুহূর্তে সমাজজীবনে অগণিত সমস্যা তৈরি হচ্ছে। স্কুলকলেজে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে, পাড়ার দুর্গাপুজোয়, রক্তদান শিবিরে... সমস্যার মোকাবিলায় নানা নাগরিকের নানা মত থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন মঞ্চে বিভিন্ন ভাবে সেই মতামতের বিনিময় এবং টানাপোড়েন সম্ভব। সম্ভাবনাটা কী, কোথায়, কতখানি, তার কোনও পূর্বনির্ধারিত উত্তর হতে পারে না। বিনিময় এবং টানাপোড়েনের চর্চাটা শুরু করতে পারলেই সেই উত্তর খোঁজা সম্ভব। সেটাই গণতন্ত্রের পথ। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র।

পরোক্ষ গণতন্ত্রকে আমরা বিদায় জানাতে পারব না, আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠিয়েই আমাদের দরকার চালাতে হবে, কারণ সেটাই বাস্তবে সম্ভব। কিন্তু তার পাশাপাশি নানা ক্ষেত্রে নানা উপলক্ষে প্রত্যক্ষ, সর্বজনীন গণতন্ত্রের অনুশীলন জরুরি। আর কোনও কারণে না হোক, আমাদের মনগুলোকে গণতান্ত্রিক অভ্যাসে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য জরুরি।